Paper - II
Library Management

একক ১ ❐ গ্রন্থাগার প্রশাসনের মূলনীতি

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ ব্যবস্থাপনা—ধারণা
১.২.১ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১.২.২ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ
১.২.৩ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলী
১.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১.৩.১ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি
১.৩.২ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য
১.৩.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা
১.৩.৪ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
১.৩.৫ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থাগার
১.৪ ব্যবস্থাপনা চিন্তাভাবনা-বিভিন্ন ধারা
১.৫ গ্রন্থাগার প্রশাসন
১.৬ অনুশীলনী
১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান, বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থাপনার যুগ। ব্যবস্থাপনা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে জড়িয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রথাগত ধারণা বা প্রধাগত শিক্ষায় সাধারণ মানুষ এখনও শিক্ষিত নয়। তবুও ব্যবস্থাপনা সাধারণ মানুষের সঙ্গো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যবস্থাপনার ধারণা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত প্রযুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হলেও একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আধুনিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গো তথ্যপ্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য—প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণের মাধ্যমে সার্বিক সাফল্য ও অগ্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সর্বোপরি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার ও প্রয়োগ। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডগুলির জন্য প্রাথমিক উদ্দেশ্য পরিকল্পনা রচনা, যা সঠিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনা হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ; প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার উপর। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের নিয়ামক হল ব্যবস্থাপনা।

সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার একটি বিশাল ভূমিকা আছে। ব্যক্তিসকলকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াকেই বলে ব্যবস্থাপনা। এই কাজ বলতে বোঝায় পরিকল্পনা করা, সংগঠন তৈরী করা, নির্দেশ দেওয়া, প্রণোদিত করা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা। যুগে যুগে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে। ধীরে ধীরে

ব্যবস্থাপনার মধ্যেও ফুটে উঠেছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা। সুবিখ্যাত চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত রেখে গেছেন। গ্রন্থাগারও সংস্থা হিসাবে এর বাইরে থাকতে পারে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থাগার প্রশাসনের মূলনীতি যে-কোনো অন্য সংস্থার ব্যবস্থাপনার মতনই অনুসৃত হয়, তবে অন্য সংস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে গ্রন্থাগার মূলত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ; তাই এক্ষেত্রে কিছু নীতির রদবদল করা হয়।

১.২ ব্যবস্থাপনা-ধারণা

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের মানবিক ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে কাজ করার কৌশলকেই ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করে, স্বল্প ব্যয়ে অধিক দক্ষতার সাথে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করে, ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্যবস্থাপনা অদৃশ্য ও অস্পর্শনীয় হলেও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনুঘটকের মতন।

কোনো উদ্যোগের জন্য সামগ্রিকভাবে নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার রূপায়নকে বলে প্রশাসন। আর প্রশাসনের নীতি ও লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক অনেকাংশে জাতি-উপজাতির মতন। তাই প্রশাসনকে বুঝতে হলে ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় সেই সব কার্যকলাপ যা পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করে, বস্তু ও অর্থ সংগ্রহ করে, শ্রমিক কর্মচারী নির্বাচন ও বিভিন্ন কাজে উপস্থাপন করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন কাজের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১.২.১ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কোনো প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে কর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দক্ষ ব্যবস্থাপনাই প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করে। প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, উৎপাদনশীলতা, সামগ্রিক সাফল্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতীত অসম্ভব। ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে বর্ণিত হল—

(১) নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর হাতিয়ার (Tool to achieve specific goals)

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানই সাফল্য পেতে পারে না। ঘড়ি যেমন স্প্রিং ছাড়া চলতে অক্ষম, তেমনই উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানও এগোতে পারে না।

(২) কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি (Main source of energy)

কোনো প্রতিষ্ঠানকে মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হলে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে ওই প্রতিষ্ঠানের মস্তিষ্ক হিসাবে ধরা যায়। মস্তিষ্ক ব্যতীত একটি মানুষ জড় পদার্থে পরিণত হয় ; যেভাবে ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠান অচল ও স্থবির হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যবস্থাপনাই কোনো প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তি।

(৩) সার্বজনীতা (Universality)

ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যেখানেই কেউ দলবদ্ধভাবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মিলিত হয়, সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

(৪) **সম্পদের সঠিক ব্যবহার (Optimum utilisation of resources)**

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ অনুমান করা হয় ; বিভিন্ন উৎস থেকে তার সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় ; এবং লক্ষ রাখা হয় যে-কোনো অবস্থাতেই যেন প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সম্পদ সংগৃহীত না হয় ; বা সম্পদ সংগ্রহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়। কোনো্ সম্পদ কতটা পরিমাণে এবং কীভাবে ব্যবহার করলে সম্পদের কাম্য ব্যবহার হবে সেদিকে লক্ষ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ফলে এক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য।

(৫) **ব্যয় সংকোচন (Reduction of costs)**

সম্পদের সঠিক ব্যবহারের সঙ্গো সঙ্গো ব্যয় সংকোচনের কথা অবধারিতভাবে এসে পড়ে। কারণ উৎপাদনের ব্যয় কম হলেই ক্রেতাদের স্বল্প মূল্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা সম্ভব। একমাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় অপচয় দূর করে উৎপাদন ব্যয় কমাতে সাহায্য করে।

(৬) **সুস্থ কর্মপরিবেশন সৃষ্টি (Creation of satisfactory working environment)**

ব্যবস্থাপনা কোনো সংস্থায় উপযুক্ত কর্মপরিবেশের সৃষ্টি করে, এবং কর্মীদের নানানভাবে অনেক বেশি দায়িত্বশীল করে তোলে। সুস্থ পরিবেশ কর্মীদের কাজের দক্ষতা, কর্মপ্রবণতা, কর্মপ্রবাহের গতিশীলতা প্রভৃতি অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়।

(৭) **জাতীয় উন্নয়ন (National Development)**

বিকাশশীল দেশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার গুরত্ব অপরিসীম। দেশে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ, এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। সম্পদের কাম্য ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করতে দক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

(৮) **বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান (Balance amidst diversity)**

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বা গোষ্ঠীর সমাবেশ দেখা যায়। একমাত্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৯) **বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান (Balance amidst diversity)**

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বা গোষ্ঠীর সমাবেশ দেখা যায়। একমাত্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

১.২.২ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Management)

ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যকলাপ গ্রহণ করে, সেগুলি যাতে সঠিক সময়ে, সঠিক দক্ষতায় ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য তিন প্রকারের হয়—

(১) **প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসমূহ (Organisational objectives)**

একটি প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কার্যকলাপ গ্রহণ করুক না কেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য হল অস্তিত্বরক্ষা ও উন্নয়ন। ব্যবস্থাপনা যে সকল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এগোতে পারে, সেগুলি হল— (ক) ন্যূনতম প্রচেষ্টার প্রয়োগে সর্বাধিক লাভ সুনিশ্চিত করা ; (খ) প্রতিষ্ঠানের মূলধনের কাম্য ব্যবহার করে ন্যায্য লাভ পাওয়া সুনিশ্চিত করা ; (গ) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তারল্য যাতে বজায় থাকে, সে ব্যবস্থা করা ; (ঘ) প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ; (ঙ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ; ও (চ) সর্বোপরি আর্থিক, মানবিক ও অন্যান্য সম্পদ সংক্রান্ত সার্বিক অপচয় রোধ করা।

(২) **ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসমূহ (Personal objectives)**

ব্যবস্থাপনা অনেক সময়ই আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ও মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের কর্মী কাজ করলেও তাদের ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকে। ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের যাতে বড় ধরনের সংঘাত না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কাজ করে। যেমন— (ক) কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের জন্য সর্বাধিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ; (খ) কর্মীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কাজের পরিবেশের ব্যবস্থা করা ; (গ) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, এবং (ঙ) কর্মীদের চাকুরির ন্যায়সঙ্গত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

(৩) **সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ (Social objectives)**

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সমাজের একটি অংশ, এবং এই প্রতিষ্ঠান সমাজের লক্ষ্যপূরণের জন্য কাজ করে। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুধু প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য পূরণ হয় না, সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্যও পূরণ হয়। উল্লেখযোগ্য সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি এইপ্রকার : (ক) সঠিক দামে, সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ; (খ) প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করা, এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা ; (গ) প্রতিযোগী সংস্থাগুলির সঙ্গে সভ্য আচরণ, ও উপযুক্ত লেনদেন করা, এবং (ঘ) সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকে অটুট রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করা।

১.২.৩ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলী (Major functions of Management)

ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু আবশ্যিক কার্যাবলী রয়েছে। হেনরী ফেয়ল (Henry Fayol)-এর মতে ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হল পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা রচনা করা, সংগঠন, আদেশদান, সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণ করা।

লরেন্স এ. অ্যাপ্লে (Lawrence A. Appley) এই মত পোষণ করেন যে ব্যবস্থাপনার মূল কাজ হল পরিকল্পনা, কার্যনির্বাহ ও নিয়ন্ত্রণ।

আর. সি. ডেভিস (R. C. Davis) বলেছেন যে ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ।

আরনেস্ট ডালি (Ernest Dale) পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও নবীকরণ ও উপস্থাপন—এই দুটি কাজকে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কুন্‌জ এবং ওডনেল (Koonty and O'Donnell) পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এল. আরউইক (L. Urwick) ব্যবস্থাপনার ছয়টি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন—পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণ।

লুথার গ্যালিক (Luther Gallick)-এর মতে ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু আবশ্যিক কার্যাবলী রয়েছে। তিনি ওইসব কার্যাবলীর ইংরেজী আদ্যক্ষর অনুযায়ী সেগুলিকে PODSCORB বলে বর্ণনা করেছেন। PODSCORB কথাটির মানে হল—পরিকল্পনা (Planning), সংগঠন (Organisation), কর্মী নির্বাচন (staffing), নির্দেশদান (Directing), সংযোজন (Co-ordinating), বর্ণনা (Reporting), এবং বাজেট প্রণয়ন (Budgeting)।

(i) **পরিকল্পনা**—কাঙ্ক্ষিত ফললাভের লক্ষ্যে সচেতনতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কার্যাবলী নির্ধারণ করাকেই বলে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা কোনো সংস্থায় অত্যন্ত জরুরী কারণ এটি কোনো কার্য সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট

ধারাবাহিক পন্থার নির্দেশ দেয়। লাইব্রেরি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অনবদ্য হয়—কারণ তাঁর পরিকল্পনাতেই গ্রন্থাগার একটি আদর্শ গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেতে পারে। লাইব্রেরি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তার ব্যবহারকারী, ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) **সংগঠন**—কোনো প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধনের এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ারই হল সংগঠন। কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি সংগঠনের উপরে নির্ভরশীল। সংগঠন ব্যতীত ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। লাইব্রেরির ক্ষেত্রে সংগঠন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। কর্মীরা দলবদ্ধভাবে দায়িত্ব নিয়ে লাইব্রেরির বিভিন্ন কাজকর্ম চালাতে সক্ষম হলেই লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের জন্য তার উপযুক্ততা প্রমাণ করবে।

(iii) **কর্মী নিয়োগ**—একটি সংগঠনের কাঠামো নির্ভর করে এর বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগের উপর। কোনো সংস্থায় দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মী—দুইই থাকে। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করাই হল ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মীদের হতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনে উৎসুক, যার ফলে গ্রন্থাগারটি তার কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

(iv) **নির্দেশদান**—ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নির্দেশনা। নির্দেশনা মূলত তিনটি কাজের জন্য প্রয়োজন—কর্তব্য নির্দিষ্ট করা, আদেশ ও নির্দেশ দেওয়া এবং গতিশীল নেতৃত্ব দেওয়া। কোনো সংস্থার উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিটি, অর্থাৎ কর্ণধার যদি সঠিকভাবে নির্দেশ না দিতে পারেন, তবে অন্যান্য কর্মীরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তাই নানারকম কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য অবিরাম সিদ্ধান্ত ও তার রূপায়ণ প্রচেষ্টায় নির্দেশদানের একান্ত প্রয়োজন আছে।

(v) **সংযোজন**—একটি সংস্থায় বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সঠিক সমন্বয় সাধন সেই সংস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য দলীয় প্রচেষ্টার সুসংহত ব্যবস্থাকেই সংযোজন বলা হয়। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাই এক্ষেত্রে সমন্বয় বা সংযোজন আরও বেশি প্রয়োজন।

(vi) **বর্ণনা প্রতিবেদন**—বিভাগীয় কাজকর্মের নানানরকম অবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করানোকেই বলা হয় বর্ণনা বা প্রতিবেদন। এই ধরনের প্রতিবেদন তথ্যভিত্তিক, পরিসংখ্যানভিত্তিক এবং সত্যভিত্তিক হওয়া উচিত। একটি সংগঠনের সুষ্ঠু কাজকর্মের জন্য এর মূল্য অপরিসীম।

(vii) **বাজেট প্রণয়ন**—আর্থিক পরিকল্পনা, হিসাবনিকাশ ও তার নিয়ন্ত্রণকে বাজেট প্রণয়ন বলা হয়। কোনো সংগঠনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সেই সংস্থার সাফল্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই বাজেট প্রণয়ন আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সুতরাং বিভিন্নভাবে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার সাহায্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহের ব্যবহার উপযুক্ত পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্বপ্রদান ও নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ত্বরান্বিত করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

১.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)

প্রশাসন নীতি নির্ধারণ করে, আর ব্যবস্থাপনা তার রূপায়ণ করে। ব্যবস্থাপনা প্রশাসনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এস. আর. রঙ্গানাথন বলেছেন "আমাদের জীবদ্দশাতেই প্রশাসন বিজ্ঞানে পরিণত।" বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনের সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ফ্রেডেরিক উইন্স্লো টেলর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় যে নতুন পদ্ধতি উন্নত, বাস্তবসম্মত উপকরণ ও সুস্পষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, এই ব্যবস্থাপনাটি বিজ্ঞানভিত্তিক, কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতিতে কাজ না করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজ করলে অনেক ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হয়। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের প্রয়োগই ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলেছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগই এই ব্যবস্থার ভিত্তি। সেজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে মানবসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচালন দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছানোর পথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা। কাজ সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানকে টেলর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন। এইভাবেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল সঠিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভূত নীতির সঠিক প্রয়োগ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কিছু সুবিধা আছে। সেগুলি হল—

(i) **কাজভিত্তিক সংগঠন**—এখানে কাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হয়, তাই যে-কোনো কাজ সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **চিরাচরিত প্রথা বর্জন**—সংস্থার প্রতিটি কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

(iii) **যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ**—কর্মচারীরা যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ পায় এবং বিভিন্ন কাজে যোগ্যতানুসারে কর্মচারীরা আসীন হয়, তাই সকলে সঠিকভাবে, সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পাদন করতে পারে।

(iv) **বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মচারী নির্বাচন**—এই ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মচারী নির্বাচন করা হয় এবং যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুসারে তাদের ভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়।

এইসব নানাবিধ কারণ হেতু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্তমানে অত্যন্ত প্রবল হয়ে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি

টেলর এই ব্যবস্থাপনার চারটি মৌল নীতির উল্লেখ করেছেন—

১। **কাজের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন**—প্রথম নীতিটি হল সংশ্লিষ্ট কর্মীকে পুরাতন ধ্যানধারণা ত্যাগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার প্রকৃত বিজ্ঞান উদ্ভাবন করবেন যাতে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়।

২। **বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ**

টেলর মনে করেন কর্মীদের বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য, তাকে সেই কাজে নিয়োগের নীতি অবলম্বন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি কর্মী নির্বাচন করা যায়, তবে প্রতিটি কর্মীকে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে।

৩। **ক্লান্তি সমীক্ষা ও সময় সমীক্ষা**—কর্মীর ক্লান্তি সমীক্ষার (fatigue study) ও সময় সমীক্ষার (time study) মাধ্যমে স্থির করা হবে কোন্ কর্মী সারাদিনে কতটা পরিমাণে কাজ করবে এবং ওই কাজ সম্পাদনে তার কতটা সময় প্রয়োজন হবে।

৪। **কাজ ও দায়িত্বের সমবণ্টন**—কর্মীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের কাজ ও দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এই নীতি কর্মী প্রণোদনার সহায়ক।

১.৩.১ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি (Principles of scientific Management) :

টেলর এই ব্যবস্থাপনার চারটি মৌল নীতির উল্লেখ করেছেন—

১। **কাজের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন**—প্রথম নীতিটি হল সংশ্লিষ্ট কর্মীকে পুরাতন ধ্যানধারণা ত্যাগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার প্রকৃত বিজ্ঞান উদ্ভাবন করবেন যাতে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়।

২। **বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ**

টেলর মনে করেন কর্মীদের বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য, তাকে সেই কাজে নিয়োগের নীতি অবলম্বন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি কর্মী নির্বাচন করা যায়, তবে প্রতিটি কর্মীকে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে।

৩। **ক্লান্তি সমীক্ষা ও সময় সমীক্ষা**—কর্মীর ক্লান্তি সমীক্ষার (fatigue study) ও সময় সমীক্ষা (time study) মাধ্যমে স্থির করা হবে কোন্ কর্মী সারাদিনে কতটা পরিমাণে কাজ করবে এবং ওই কাজ সম্পাদন তার কতটা সময় প্রয়োজন হবে।

৪। **কাজ ও দায়িত্বের সমবণ্টন**—কর্মীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের কাজ ও দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এই নীতি কর্মী প্রণোদনার সহায়ক।

এই নীতিগুলি নিম্নে বিশদভাবে বোঝানো হল :

(১) নির্দিষ্ট কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে ;

(২) প্রত্যেক কর্মীকে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য সময় স্থির করে নিতে হবে ;

(৩) কর্ম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত মানের যন্ত্রপাতির সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে ;

(৪) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলে কর্মীদের উৎসাহমূলক মজুরীর ব্যবস্থা রাখতে হবে ;

(৫) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে ;

(৬) কর্মী নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ;

(৭) কাজের বণ্টনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতার নীতি অনুসরণ করতে হবে ;

(৮) উন্নতমানের কর্মের পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ;

(৯) সর্বোপরি ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১.৩.২ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য (Features of Scientific Management)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের প্রচলিত সনাতন রীতিনীতির পরিবর্তে যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক রীতিনীতির অনুসরণ। টেলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়ঃ

(i) গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ;

(ii) বিভাজন নয়, সংহতি সাধন ;

(iii) ব্যক্তি প্রাধান্য নয়, সহযোগিতা ;

(iv) নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের পরিবর্তে সর্বাধিক উৎপাদন ;

(v) ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সমৃদ্ধির সর্বাধিক উন্নয়ন ;

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল :

(i) সনাতন, গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবোচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ;

(ii) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত শ্রমিক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ;

(iii) সময় নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা ও কাজের গতিনিরীক্ষা করা ;

(iv) কর্মীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, ও তাই ক্লান্তি নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(v) প্রেরণামূলক মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করে কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা ;

(vi) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে কাজের পরিবেশকে উন্নত করা ;

(vii) উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কাজের উপকরণ ও উপযুক্ত রসদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি করা ;

(viii) পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্যে পৃথকীকরণ।

১.৩.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা (Advantages of Scientific Management)

(১) **কর্মভিত্তিক সংগঠন**—যেহেতু এখানে কর্মভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হয়, তাই যে-কোনো ধরনের কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায়, যার দ্বারা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

(২) **চিরাচরিত প্রথা বর্জন**—সংস্থার প্রতিটি কাজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাজন, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(৩) **যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ**—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ, পদাধিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি করা হয় ; তাই উৎপাদন শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

(৪) **বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মচারী নির্বাচন**—এই ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, এবং তাদের যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়।

(৫) **সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি**—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় সমাজে কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়, এবং জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

১.৩.৪ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে যে-কোনো প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। টেলর এই ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের সময় বলেন— "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সারমর্ম হল এমন এক দর্শন যার মধ্যে ব্যবস্থাপনার চারটি মহৎ নীতির মিলন ঘটেছে— (ক) প্রকৃত বিজ্ঞানের বিকাশ ; (খ) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কর্মী নির্বাচন ; (গ) কর্মীদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বিকাশের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ ; (ঘ) পরিচালন ও কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন (Scientific Management in its essene, consists of a certain philosophy, which results in a combination of the four great underlying principles of management—first, the development of a true science (organised study and analysis of individual work); second, the scientific selection of the employees; third, his scientific education and development; fourth, intimate friendly cooperation between the management and their men).

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যেহেতু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুগঠিত, তাই এর অগ্রগতি বজায় রাখা দরকার। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বলাভ করেছে—তাই এই দিকটিও সমানভাবে লক্ষ রাখতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে সমস্ত ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৩.৫ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থাগার

তথ্যনির্ভর সমাজে গ্রন্থগারগুলির চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারগুলি নতুন ভূমিকা পালন করছে। গ্রন্থাগারগুলিকে বর্তমানে তথ্যকেন্দ্র (Information Centre) বা জ্ঞানকেন্দ্র (Knowledge Centre) হিসাবে অভিহিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলির প্রয়োগ ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়—উচ্চস্তর (top), মধ্যমস্তর (middle), এবং নিম্নস্তর (lower) গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে আসীন থাকেন মুখ্য গ্রন্থাগারিক, মধ্যমস্তরে থাকেন উপ বা সহ গ্রন্থাগারিক, ও নিম্নস্তরে আসীন থাকেন গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীসমূহ। এঁদের গ্রন্থাগার সহকারী বলা হয়। এই তিনটি স্তরে নিম্নে বর্ণিত কর্মগুলি সম্পন্ন করা হয়—

উচ্চস্তর—সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা অর্পণ, সিদ্ধান্ত অনুমোদন, নির্দেশ দান এবং প্রতিবেদন ও পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের পর্যালোচনা।

মধ্যমস্তর—মুখ্য কার্যনির্বাহককে সাহায্য করা, অধস্তন কর্মীদের নেতৃত্বদান, সমুদয় কর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রভৃতি।

নিম্নস্তর—সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান, কর্মী ও কর্তৃপক্ষের সাথে প্রশাসনিক যোগসূত্র বজায় রাখা, নির্দেশদানের মধ্যে সমস্ত নিম্নস্তরের কর্মীদের কাজ করিয়ে নেওয়া।

গ্রন্থাগারের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রেই। গ্রন্থাগারে এই পদ্ধতির সুফল এইভাবে লক্ষ করা যায় :

(১) যুক্তিনির্ভর তথ্যের আদানপ্রদান বৃদ্ধি করা যায়।

(২) গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যার সমাধান করা যায়।

(৩) গ্রন্থাগারে কাজকর্ম অধিকাংশই পুনরাবৃত্তিমূলক ও যান্ত্রিক। কাজকর্মে দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অবদান অসীম।

(৪) এই পদ্ধতি কর্মীদের ব্যবস্থআপনা ও আর্থিক প্রশাসনের পক্ষে সহায়ক।

১.৪ ব্যবস্থাপনা চিন্তাভাবনা—বিভিন্ন ধারা

ব্যবস্থাপনার ধারণা কিন্তু মোটেও আধুনিক প্রজন্মের ধারণা নয়। যুগে যুগে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতায়, মধ্যযুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ ব্যবস্থাপনার উপর তাদের মূল্যবান মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে **এফ. ডবলিউ টেলর** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নামে একটি নতুন ধারণার সূত্রপাত করেন। তাই টেলরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। এই সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরেই আসে হেনরি ফয়েলের কথা। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য বিখ্যাত। তাঁর মত অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার কাজভিত্তিক ধারণা সর্বজনীন এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য তাঁর প্রস্তাবিত ১৪টি ব্যবস্থাপনা নীতি উল্লেখযোগ্য। যেগুলি হল—কাজ বিভাজন অর্থাৎ সমস্ত কাজকর্মকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে এক-একটি অংশের ভার এক-একজন ব্যক্তিকে দিতে হবে ; ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রশাসককে যথোপযুক্ত কর্তৃত্ব দিতে হবে ; কোনো প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য শীর্ষে দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করা প্রয়োজন ; কর্তৃত্বে প্রয়োগে একতা থাকা দরকার ; যে সকল কাজের একই উদ্দেশ্য তাদের জন্য একজন প্রধান ও একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন ; কর্মীদের পারিশ্রমিক ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; প্রশাসনিক ক্ষমতা সর্বদাই কেন্দ্রীয়করণ করতে হবে ; সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ক্ষমতা ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে দেওয়া প্রয়োজন ; প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার প্রবর্তন ; দলীয় কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একতাই সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের সকলক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার প্রবর্তন। ফয়েলের নীতি ও পদ্ধতি খুবই সূক্ষ্ম ও মার্জিত এবং তার চিন্তাধারা অনেক বাস্তবসম্মত। তাঁর নির্দেশিত নীতিগুলি প্রতিটি সংস্থার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

লিন্ডাল আরউইক (Lyndall Urwick) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বহু বই লেখেন, যার মধ্যে ১৯৪৩ সালে তাঁর লেখা 'এলিমেন্টস অব অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তাধারা সমন্বয় ও সংহতিই হল ব্যবস্থাপনায় আরউইকের মহান অবদান।

এলটন মেয়ো (Elton Mayo) মানবিক সম্পর্কগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জনক। তিনি বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যখন কোনো শ্রমিকদের আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তখন তাদের উৎপাদন ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। কর্মীদের থেকে সর্বোৎকৃষ্ট কাজটি পেতে হলে তাদের মানসিকতা বুঝতে হবে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে—এই মানবিক মতবাদের জন্য মেয়োর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রণোদনামূলক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ. এইচ. মাসলো (A. H. Maslow) একটি উল্লেখযোগ্য নাম। প্রণোদনা বলতে বোঝায় যে-কোনো বাঞ্ছনীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রশংসা, অর্থ, পদোন্নতি ইত্যাদি দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বা নিজেকে উদ্দীপ্ত করা। মাসলো মানুষের অভাবকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—যেমন দৈহিক অভাব, নিরাপত্তার অভাব, সামাজিক অভাব, মর্যাদার অভাব ও নিজেকে প্রকাশজনিত অভাব। ব্যক্তির কী অভাববোধ আছে তার উপর তার প্রণোদনা নির্ভর করে। কোনো সংস্থায় কর্মীদের আচরণ যথার্থ প্রণোদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor) বিখ্যাত তার 'ওয়াই' তত্ত্ব রূপায়ণের জন্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমস্ত দক্ষ প্রশাসকের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সকল ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় সকল কাজ করতে পারে এবং যে যেমন দক্ষতা দেখাবে তাকে সেভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

এই সমস্ত মতবাদ ছাড়াও আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিশেজ্ঞরা নতুন নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই পদ্ধতিগুলি হল পরিমাণগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং পদ্ধতিমূলক ব্যবস্থাপনা।

১.৫ গ্রন্থাগার প্রশাসন

অন্যান্য সংস্থার মতন গ্রন্থাগার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন করা হয়। গ্রন্থাগারের কাজকে গ্রন্থাগারিক এমনভাবে পরিচালিত করবেন যাতে তা কর্মী ও জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয় এবং কর্মীরা তাদের পুরোমাত্রায় সেবা দিতে পারে। গ্রন্থাগার প্রশাসনের নীতি কিছু বিষয়ের উপর নির্ধারণ করা হয়—

(১) গ্রন্থাগার যেহেতু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাই সমাজের নিয়ম ও আদর্শ মেনে চলা এর কর্তব্য।

(২) সমাজ গ্রন্থাগারের কাজ থেকে অভীষ্ট সেবা প্রত্যাশা করা। তাই গ্রন্থাগারের সমাজসেবায় মনোনিবেশ করা উচিত।

(৩) সরকার গ্রন্থাগার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেন। তাই গ্রন্থাগারের উচিত সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

(৪) কর্মীদের সহায়তা গ্রন্থাগারের একটি মহান সম্পদ। তাই তাদের প্রতি সুব্যবহার করা ও তাদের পুরস্কৃত করা গ্রন্থাগারের একটি মহান কর্তব্য।

গ্রন্থাগারের প্রশাসন বলতে আমরা বুঝি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য ও তার উৎস, কর্মী, আসবাবপত্র এবং অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যাতে গ্রন্থাগারের মূল নীতির রূপায়ণ করা যায়। যেহেতু গ্রন্থাগার মূলত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে অনেক কাজকর্ম অন্যান্য লাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়। সেক্ষেত্রে যে-কোনো সংস্থার ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলি (যা আগে বলা হয়েছে) গ্রন্থাগার প্রশাসনের জন্য কিছুটা রদবদল করে অনেক সময় রূপায়িত করা হয়। গ্রন্থাগার প্রশাসকের মূলত তিনটি কাজ আছে— (i) যোগাযোগ রক্ষা করা—তিনি সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগাযোগের সবচেয়ে বড় মাধ্যম—অর্থাৎ তাকে লিয়াজো অফিসারও বলা যায় ; (ii) তথ্য সরবরাহ করা—বিভিন্ন রকমভাবে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন ধরনের তথ্য তিনি পরিবেশন করেন ; (iii) সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা—নতুন নতুন ভাবধারা রপ্ত করা ও গ্রন্থাগার তথা সমাজের উন্নয়নের জন্য সেগুলি প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগার নেন এবং তার সাথে সাথে নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলাও তিনি করেন।

এই তিন ধরনের ভূমিকায় যথার্থ পারদর্শী হতে হলে গ্রন্থাগারে প্রশাসন অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন, সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিকভাবে হওয়া উচিত। বর্তমানে তথ্যনির্ভর সমাজে এর যৌক্তিকতা আরও বেশিভাবে প্রকট হয়েছে কারণ গ্রন্থাগার আজ আর শুধু পুরানো ধারণায় গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র নয়। সুতরাং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা দিনে দিনে আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাও ধীরে ধীরে আরও বেশি করে প্রকট হচ্ছে। তাই গ্রন্থাগার প্রশাসন আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নীচের সারণিতে গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যগুলি তুলে ধরা হল :

গ্রন্থাগারের কাজ	**প্রশাসনিক কার্যাবলী**	**উদ্দেশ্য**
তথ্য সরবরাহ ও ডকুমেন্টেশনের কাজ, যেমন ক্যাস (CAS), সূচি করা ইত্যাদি	কর্মসূচি মূল্যায়ন পর্যালোচনা কৌশল বা PERT	প্রকাশনার জন্য এবং সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজন
তথ্য সংক্রান্ত সেবা এবং তথ্যভিত্তিক উপাদান	ব্যবসা করার কৌশল	ব্যাপক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন
পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	নেট্ওয়ার্ক পর্যালোচনা	আদর্শ পরিকল্পনার ভিত্তি ও মডেল রূপায়ণ
ভবিষ্যৎ আভাস	ডেলফি রীতি	কার্যাবলীর ও বিভিন্ন সেবার পরিকল্পনা করা
সাধারণ প্রশাসন	এম.আই.এস (MIS) বা প্রশাসনিক তথ্য ব্যবস্থা (Management Information System)	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
বাজের প্রণয়ন	পি.পি.বি.এস (PPBS—Planning Program Budgeting System or Performance Budget) এবং জেড.বি.বি (ZBB-Planning Program Budgeting System or Performance Budget) বাজেট ব্যবস্থা	বিভিন্ন ধরনের বাজেট প্রণয়ন
দৈনন্দিন কাজকর্ম	কম্প্যুটারের বিভিন্ন কাজকর্ম	বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কাজকর্মের সহজ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করা।

১.৬ অনুশীলনী

১। ব্যবস্থাপনা যে-কোনো সংস্থার মস্তিষ্ক—আলোচনা করুন।

২। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য কী ? গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারর বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। লুথার গ্যালিকের ধারণানুযায়ী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৬। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও নীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৭। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বহন করছে—আলোচনা করুন।

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. Mittal, R. L.—Library Administration : theory & practice. 2001

২. Mahapatra, P. K.—Library Management. World Press, 1997

৩. বিলাস কুমার বিশ্বাস—আধুনিক ব্যবস্থাপনা, ১৯৯৭

৪. শ্যামলেশ মাইতি—ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়নের রূপরেখা, ১৯৯৯

৫. সঞ্জীব কুমার বসু—কারবার ব্যবস্থাপনা, ২০০৩

৬. সুশীলকুমার গুপ্ত—গ্রন্থাগার প্রশাসন, ১৯৮৯

৭. বিশ্বজিৎ ভদ্র ও অশোক সৎপতি—কারবার ব্যবস্থাপনা, ২০০৫

৮. পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়—কারবার ব্যবস্থাপনার রূপরেখা, ২০০৪